বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ নভেম্বর, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ২৪ নভেম্বর, ২০২৫, সোমবার, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 44, Monday, 24 November 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

শ্রমকোডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর : শ্রমকোড-এর প্রতিবাদে বর্ধমান শহরে সিআইটিইউ-র চারটি সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে কার্জনগেট চত্বরে বিক্ষোভ সভা ও প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিল শেষে কার্জনগেট চত্বরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিক সহ খেটে খাওয়া মানুষ। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ও শ্রম কোডের প্রতিলিপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। সভা সভাপতিত্ব করেন কাজল রায়। বক্তব্য রাখেন দীপঙ্কর দে, নাসিম আহমেদ, প্রলয় আইচ ও দেবদুলাল ঠাকুর। এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশা শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে আগামী ২৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেডইউইনয়ন এ ফেডারেশনগুলির আহ্বানে বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হবে।

শ্রমকোডের বিরুদ্ধে কালনা শহরে তীব্র প্রতিবাদ জানায় শ্রমজীবী মানুষ। সিআইটিইউ-এর কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এদিন শ্রমজীবী মানুষরা জমায়েত হন কালনা রাজবাড়িতে। সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়ে সারা কালনা শহর পরিক্রমা শেষে স্টেডিয়ামের সামনে এসে হাজির হয়। সেখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা কেশবচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জিত মুখার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী প্রমুখ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির মেমারি ও ভাতারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৩ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির উদ্যোগে ও শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির সহযোগিতায় যৌথ কমিটির পূর্ব বর্ধমান জেলার ত্রয়োদশ সম্মেলন উপলক্ষে একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় নিমো ১ পঞ্চায়েতের অধীনে দেহুরা গ্রমের বারোয়ারীতলায়। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির সম্পাদক সমীর প্রধান। উদ্বোধক ছাড়াও বক্তব্য রাখেন শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির পক্ষে ড. সম্বরণ প্রামাণিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন তুষার ঘোষ। স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। মোট ১৪৭ জন গ্রামের শ্রমজীবী ও খেতমজুর মানুষেরা এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এসে তাদের রোগ পরীক্ষা করান। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী ও ডাঃ বাসুদেব রায়চৌধুরী। ১৯ নভেম্বর ভাতার থানার সোৎখালি আদিবাসী পাড়ায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির হয়। ১১২ জনের পরীক্ষা করা হয় এং ৩৭ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ স্বপন বণিক, গীষ্পতি চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু রায় প্রমুখ।

‘বাংলা বাঁচাও’-এর ডাক দিয়েছে সিপিআই(এম)

২৯ নভেম্বর পদযাত্রা শুরু হচ্ছে তুফানগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর : সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি বাংলা বাঁচাও যাত্রার ডাক দিয়েছে। ২৯ নভেম্বর যাত্রা শুরু হবে কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থেকে ১৭ ডিসেম্বর শেষ হবে উত্তর ২৪ পরগণার কামারহাটিতে। আশু দাবি-দাওয়া সহ জল-জঙ্গল-জমিন রক্ষার্থে বাংলার ঐতিহ্য, গণতন্ত্র, সম্প্রীতি সৌহার্দ্য রক্ষার আবেদন সহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ভেদাভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধ হলো এই পদযাত্রার আহ্বান। এর সঙ্গে রাজ্যে আর্থিক-রাজনৈতিক দাবিগুলি রয়েছে। এই পদযাত্রা বর্ধমানে প্রবেশ করবে ১২ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় নদিয়ার নবদ্বীপ থেকে হেমাতপুরে। সকাল ৯টার হেমাতপুর বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে সমাবেশ। এরপর নাদনঘাট মোড় হয়ে রাইগ্রাম হয়ে কুসুমগ্রাম পর্যন্ত বাইক মিছিল। কুসুমগ্রামে জনসংযোগ করবেন পদযাত্রীরা। এরপর সাতগেছিয়া, সাতগেছিয়া থেকে মেমারি। মেমারিতে অনুষ্ঠিত হবে সমাবেশ। এই পদযাত্রাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

পদযাত্রাকে সফল করতে ও ব্যাপক মানুষকে সম্মিলিত করতে এলাকায় এলাকায় প্রচার ও পদযাত্রা কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত

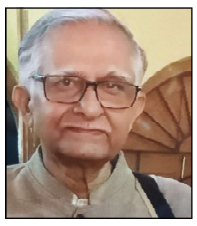

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমানের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক দুর্গাপদ চ্যাটার্জী (৮১) ১৮ নভেম্বর রাতে বর্ধমানের একটি বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বর্ধমান টাউন স্কুল, কোড়ার হাইস্কুল, রামগোপাল পুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এবিটিএ এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন ও বর্ধমান শিক্ষক সংসদের আমৃত্যু সদস্য ছিলেন। ১৯ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁর ছাত্র, সহকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ। শ্রদ্ধা জানান প্রবীণ শিক্ষককনেতা দুর্গাশিব রায়, সিপিআই(এম) নেতা সুদীপ্ত গুপ্ত, দীপঙ্কর দে, শিক্ষাবিদ নূরুল হক, সুকৃতি ঘোষাল, দেবাশিস সেন, এবিটিএ জেলা সম্পাদক শিবশঙ্কর সাহা প্রমুখ। তাঁর মরদেহ টাউন স্কুলে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ছাত্র-শিক্ষকরা। এদিন বর্ধমানের নির্মল ঝিল স্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রী আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তিনি রেখে গেছেন পুত্র, কন্যা, জামাতা সহ বহু গুণমুদ্ধদের।

ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ নভেম্বর : প্রত্যন্ত দুর্গম ও পশ্চাৎপদ এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে একটি ভ্রাম্যমান অ্যাম্বুলেন্সের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করলেন মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ দেবাশীষ বালা, মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান, মেমারি-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি,সহ মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকল স্বাস্থ্য কর্মীরা। উপস্থিত হন জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা জয়রাম হেমরম।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি বিধানসভা, খণ্ডঘোষ বিধানসভা, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা, মঙ্গলকোট বিধানসভা এবং আউসগ্রাম বিধানসভা এলাকায় এই ভ্রাম্যমান অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন হয় এদিনই।

নাড়া পোড়ানো আজও অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ নভেম্বর : বিজ্ঞানকর্মী ও সরকারি সতর্কতা অগ্রাহ্য করেই কালনার বিভিন্ন গ্রামে ধানের নাড়া পোড়ানোর ট্রাডিশন আজও অব্যাহত। সেই ছবি উঠে আসছে কালনা-১ এবং কালনা-২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে। এবছরও সরকারি আধিকারিকরা নাড়াপোড়ানোর বিরুদ্ধে কৃষকদের সাবধান করেছেন। অন্যদিকে পরিবেশের উপর নাড়া পোড়ানোর বিরূপ প্রভাব পড়ার সচেতনতা মূলক প্রচার চালিয়েছেন বিজ্ঞান কর্মীরাও। কিন্তু এইসব প্রচার কাজে আসেনি। আর্থিক লাভের জন্য কৃষকরা মাঠে যন্ত্র নামিয়ে ধান কাটছেন। জমিতেই পড়ে থাকা খড় বা নাড়া শুকিয়ে যাওয়ার পর আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন।

নাড়ার আগুনে জ্বললো জমির গাছধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ নভেম্বর : মাঠে যন্ত্রের কাটা ধানের নাড়া পোড়াতে গিয়ে গভীর রাতে পুড়ে গেল এক কৃষকের জমিতে পড়ে থাকা কাটা গাছধান। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কৃষক ফোরহান শেখের বাড়ি কালনা-১ ব্লকের কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিমলা গ্রামে। তিনি শ্রমিক দিয়ে ১২ কাঠা জমির ধান কেটে জমিতেই শুকাতে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ওই মাঠেই যন্ত্র দিয়ে ধান কেটেছিলেন কয়েকজন কৃষক। এই ধানের নাড়া জমিতেই পড়েছিল। কোন কৃষক রাত্রিবেলা সেই নারায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ফোরহান শেখের জমিতে। তাতেই পুড়ে ভস্মীভূত হয় জমির সমস্ত ধান।

জেলায় আলু চাষ এবার ব্যাপক কমবে, বাড়ছে আশঙ্কা

কিশোর মাকর

পশ্চিম বঙ্গের দ্বিতীয় অর্থকড়ি ফসল আলু। সেই আলু চাষ থেকে এবার মুখ ফেরাছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আলুচাষিরা। পরপর চার বার লোকসান খেয়ে এবার আলু চাষ কমিয়ে অন্য বিকল্প চাষে ঝুঁকছে তারা।

জেলায় আলু চাষ শুরু হয়েছে। মেমারি, জামালপুর, পূর্বস্থলি তে পুরোদমে শুরু হয়েছে। মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, খণ্ডঘোষ, রায়না এলাকাতে দেরিতে ধান ওঠায় মাটি তৈরি শুরু হয়েছে। সকলেই এবার অর্ধেক চাষ করে ঝুঁকি বাড়াতে চাইছে না। গতবার জেলাতে আলু চাষ হয়েছিল ৭৩ হাজার একর জমিতে। এবার তা কমে কত হবে তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। জেলাতে দুরকম আলু চাষ হয়। একটি

জলদি জাতের পোখরাজ, অন্যটি জ্যোতি। এই জ্যোতি আলু চাষ হয় দেরিতে। সমস্ত আলুচাষ এলাকায় এই জ্যোতি চাষ বেশি হয়। পোখরাজ আলু আগেই চাষ হয়েছে। এখন জ্যোতি আলু চাষের মাটি তৈরি হচ্ছে। কোথাও লাগানো চলছে।

জামালপুরের চাষি সুকুমার ডকাল জানালেন প্রতিবার পাঁচ বিঘা করে আলু চাষ করতাম, এবার ঘর খরচের মত এক বিঘা চাষ করবো। বাকিটা বোরো চাষ করবো। প্রতি বছর আলু উৎপাদনে বাড়ছে খরচ, কমছে বিক্রির দাম। এবার বিঘা পিছু খরচ হবে ৪০ হাজার। বিঘা পিছু গড় উৎপাদন ৭০-৮০ বস্তা। মাঠে ন্যূনতম ৭০০ টাকা বস্তা দাম পেলে চাষির লাভ হয়। গত বছর মাঠে বিক্রি হয় ৪০০ টাকা বস্তা। দাম না ওঠার একমাত্র কারণ আলু ব্যবসায়ীরা আলু রাখতে অনাগ্রহী। সরকার ও পাশে দাঁড়ায় না। ইউ পি, পাঞ্জাবের আলু বঙ্গে ঢেপিয়ে দিচ্ছে। আলু চাষ আর অর্থকড়ি ফসল থাকবে না। মেমারির আলু চাষি সাহেদুল ইসলাম জানালেন এখানকার এক বড় চাষি ৩০ বিঘা আলু চাষ করতেন, তিনি এবার তিন বিঘা চাষ করছেন। তিনি নিজে পাঁচ বিঘা আলু চাষ করতেন এবার এক বিঘা চাষ করবেন ঘর খরচের জন্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আলু ব্যবসায়ী জানালেন আলু চাষিদের প্রতি এই সরকারের কোনো দরদ নেই। এই চার, পাঁচ বছর সরকার আলু বাইরে যেতে দিচ্ছে না। সারা রাজ্য পাঁচ, ছয় কোটি উৎপাদিত আলুর প্যাকেট রাজ্যে থেকে গেলে দাম বাড়বে কি করে? নতুন আলু ওঠার আগে পর্যন্ত এখনও ৩০ ভাগ আলু স্টোরে থেকে গেছে। যে আলু মাঠে চারশো টাকা বস্তা বিক্রি হয়েছে, তার এখন স্টোরে ৩০০ টাকা বিক্রি। বেশির ভাগ আলু ব্যবসাদার সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে আর আলু হিমঘরে রাখতে চাইছে না। ফলে স্টোর মালিকরা বাইরের আলু রেখে স্টোর ভরাচ্ছে। জেলাতে ১০৩টি হিমঘর আছে। আলু ওঠার পর হিমঘর গুলিতে আলু স্টোর হয়েছে ২ কোটি ৫৭ লাখ ৭৮ হাজার ১ শত ছাপান্ন প্যাকেট। অর্থাৎ ৮১.৬৮ শতাংশ। অথচ হিমঘর গুলিতে মোট ক্যাপাসিটি ৩ কোটি ১৫ লাখ ৫৭ হাজার প্যাকেট।

নতুন চিঠি

২৪ নভেম্বর, ২০২৫

শ্রমবিধি ও প্রতিবাদ

২১ নভেম্বর কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশে চার শ্রমবিধি চালু হয়ে গেল। এর মধ্যে বেতনবিধি ২০১৯ সালে এবং শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক তিনটি বিধি ২০২০ সালে আইনসভায় অনুমোদিত হয়। সম্ভবত, কৃষক আন্দোলনের চাপে কৃষি আইন প্রত্যাহারে বাধ্য হয়ে এতদিন এই চার শ্রমবিধি কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়নি সরকার। নির্বাচনী বন্ডে যে শিল্পপতিরা টাকা দিয়েছে তারা হিস্যা বুঝে নেওয়ার জন্য চাপ দেবেই। তাই হয়তো আগের ২৯ শ্রমআইন বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে এই নতুন হলো। এই পরিবর্তনকে যুগান্তকারী, এর ফলে দেশের সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৫০ কোটি মানুষ উপকৃত হবে বলে সরকার যতই ঢাক পেটাক এটি শ্রমিক-বান্ধব হলে দেশের দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন একযোগে এর বিরোধিতা করত না।

নতুন আইনে দেশব্যাপী এক ন্যূনতম মজুরি, ৫ বছর অন্তর পর্যালোচিত হবে, প্রদানের কথা আছে, কিন্তু তা স্থির করার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়নি। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পোর্টেবেল করার কথা বললেও EPFO আইন আটকে রাখা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কর্মসংক্রান্ত সুবিধা নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বর করা হয়েছে— যেমন পরিযায়ী শ্রমিকদের সারা দেশের জন্য এক রেশন কার্ড, কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের নৈশকালীন নিরাপত্তা, ২০ দিন কাজের জন্য ১ দিন ছুটি ইত্যাদি। আসলে এসব কথার কথা। কারণ কেন শ্রমের পরিযান, কেন রাজ্যে রাজ্যে মজুরির তারতম্য, কেন লিঙ্গবৈষম্য—এই মৌলিক প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর নেই। শিল্পসম্পর্ক ও বিবাদ মেটানোর বিধিতে লেবার কোর্ট তুলে দেবার, ৫১ শতাংশ শ্রমিক-সমর্থন পাওয়া ইউনিয়নই স্বীকৃতি পাবে এসব কথা বলা হয়েছে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন বাড়বে, সুবিধা হবে মালিকপক্ষের। সবচেয়ে মারাত্মক কথা হলো, ৩০০ জনের কম শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্পে যখন-তখন ছাঁটাই করা যাবে। কে না জানে, বর্তমান অ-শ্রম-নিবিড় শিল্পদুনিয়ায় খুব কম ক্ষেত্রেই ৩০০ জনের বেশি শ্রমিক পাওয়া যাবে।

এই শ্রমবিধি কার্যকর করার বাধ্যবাধকতা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু কোনো পরিকল্পনা নেই। বস্তুত বিবিধ অসংগঠিত ক্ষেত্রকে সুরক্ষার আওতায় আনার কথা ছাড়া ইতিবাচক বিষয় তেমন কিছু নেই। যা আছে তা হল হায়ারিং এবং ফায়ারিং-এর ছাড়পত্র যা মালিকের স্বার্থকেই রক্ষা করবে। শিল্প কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ের বিষয় তাই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করতে হবে। সর্বত্র সেসব নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়নি, সবচেয়ে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে চার বিধির কোনটি নিয়েই নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়নি—১০ বছর চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়নি। খাতায় কলমে না দেখিয়েও কাজের টার্গেট দিয়ে শিল্পপতিরা দৈনিক শ্রমঘণ্টা বাড়িয়ে নিয়েছে। গিগ শ্রমিকদের অবস্থা করুণ, কখন কাজ আছে কখন নেই বলাই শক্ত। তাদের কাজ কমিশনভিত্তিক, সেক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি কিভাবে স্থির হবে—কোনো শব্দ নেই। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এই শ্রমবিধির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিবাদ তাই একান্তই প্রয়োজন। কৃষকদের মতো রাস্তায় নেমে আন্দোলন না করলে সরকার রক্তচোষা শিল্পপতিদের স্বার্থই রক্ষা করবে—মজদুরের সর্বনাশে কেন্দ্রের বা এ রাজ্যের সরকারের কিছু যায় আসে না।

আধুনিক মৎস্য চাষ দেখতে বিহার থেকে কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ নভেম্বর : অত্যাধুনিক মৎস্য চাষের প্রকল্প দেখতে বিহার থেকে কালনায় এলেন ৩০ জন মৎস্যজীবী। তারা এদিন কালনায় বিজয় রায়ের গড়ে তোলা অত্যাধুনিক মৎস্য প্রকল্প 'মা লক্ষ্মী ফ্রেসারিজ প্রাইভেট লিমিটেড' হ্যাচারিটি নিখুঁতভাবে ঘুরে দেখেন। উল্লেখ্য বিহারের মৎস্য দপ্তর তাদের রাজ্যের ৩০ জন মৎস্যজীবীকে অত্যাধুনিক মাছ চাষের প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বারাকপুরের 'সিপরি' মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠায়। বারাকপুরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আবার সেই ৩০ জন প্রশিক্ষণ প্রার্থীকে অত্যাধুনিক

মৎস্য চাষ কি করে হয় তা হাতে-কলমে দেখার জন্যই কালনা শহরে পাঠান। অত্যাধুনিক মৎস্য চাষ প্রকল্প হলো মাছ চাষের একটি উন্নত এবং আধুনিক পদ্ধতি। যা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ উৎপাদন এবং বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। এই ধরনের প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো মাছ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং মাছ চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ নভেম্বর : ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টিরী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে আজ সেহরা বাজারে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৭ জন মহিলা সহ ৩৮জন রক্তদান করেন।

তত্ত্ব ও প্রয়োগের অসাধারণ মেলবন্ধনে এঙ্গেলস

শশধর মিস্ত্রি

২৮ নভেম্বর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ

র‍্যামগেটস, সমুদ্রতীরে একটি মেলা চলছে, নানান রঙের বেলুন, নাগরদোলা, হাজার জিনিসের দোকান। ব্রাজিলের জেনারেলের পোশাক পরা এক বামন সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ লন্ডনবাসীরা এই মূর্তিকে দেখে খুবই মজা উপভোগ করছে। তার সঙ্গে অনেকেই কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনো উত্তর পাচ্ছে না। কৌতূহল হয়ে এক যুবক প্রথমে পর্তুগীজ পরে স্প্যানিশ ভাষায় কিছু কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু ওই বামনটি কোনো সাড়া দিল না। অবশেষে জেনারেলটি এক আধটি শব্দ উচ্চারণ করলে, যুবকটি এতে অবাক হয়ে গিয়ে বললেন— ''আরে তোমাদের ব্রাজিলিয়ান তো দেখছি আসলে আইরিশ ম্যান। এরপর যুবকটি ওই বামনের সঙ্গে তারই উপভাষায় কথা বলতে লাগলো। বেচারা বামন আনন্দে কেঁদে ফেললো।

এই যুবকটি হলেন ফেডরিখ এঙ্গেলস। যাঁকে বলা হয় 'পাণ্ডিত্যের বিশ্বকোষ'। কার্ল মার্কসের ভাষায় এই বিনয়ী মানুষটি 'এক দুর্লভ চিন্তাশীল' মানুষ। এক বিখ্যাত ব্যক্তি ঠাট্টা করে বলেছিলেন— ''এঙ্গেলস তো গোটা বিশ্বকে ভাষায় তোতলান।'' উত্তেজিত হয়ে উঠলে এঙ্গেলস একটু তুতলে কথা বলতেন। ইউরোপীয় ভাষা সমূহ এমনকি আঞ্চলিক উপভাষাগুলি সম্পর্কেও এঙ্গেলসের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। উপভাষাগুলিতেও তিনি অবিশ্বাসী রকম দক্ষতায় কথা বলতেন। তাঁর স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজ ভাষায় প্রচণ্ড দখল ছিল। তাঁর কাছে যে চিঠিই আসুক তিনি প্রেরকের মাতৃভাষায় উত্তর দিতেন। যেমন রাশিয়ানদের রুশ, ফরাসিদের ফরাসি, পোলদের পোলিশ, এমনকি আঞ্চলিক ভাষাতেও নিজ হাতে লিখে উত্তর দিতেন।

এঙ্গেলস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ না করেই সাংসারিক কারণে বার্মেন শহরের একটি সদাগরি সংস্থায় কর্মচারী হিসাবে একটি কাজে নিযুক্ত হন। তাঁর বাবা ছিলেন সুতাকলের মালিক। অন্য ভাই বোনেরা তাঁদের বংশগত পেশায় লিপ্ত হন। কিন্তু এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তা ধারা একটু অন্য ধরনের। তাঁর মন-প্রাণ পয়সা রোজগার করে সম্পত্তি বাড়ানোর প্রতি অনুরাগী নয়। তাঁর বাবা এটা লক্ষ করে তাঁকে বিপ্লবী কাজকর্ম ও বিপ্লবের আদর্শ থেকে দূরে রাখতে জার্মানি থেকে কিছুটা দূরে ইংলন্ডে প্রেরণ করবার জন্য উদ্যোগী হলেন। এর ফলে নভেম্বর মাসে ১৮৪২ খ্রিঃ এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার এলেন তাঁর পিতার সুতা কলে ব্যবসা বাণিজ্যের শিক্ষা লাভের জন্য। আসার পথে বোলন শহরে কার্ল মার্কসের সঙ্গে দেখা করলেন। এটাই দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ। এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে প্রায় দু-বছর ছিলেন। সুতা কলে কাজ করার সময় শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পান। শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা এদের কাছ থেকে উপলব্ধি করলেন। এখান থাকাকালীন তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতি ঝোঁক বেড়ে যায়। প্রলেতারীয় কমিউনিজমের উপর দৃঢ় হয় বিশ্বাস।

প্রাশিয়ার রাইন প্রদেশের বার্মেন ও লন্ডন শহরে শ্রমিকদের বাসস্থান ও জীবনযাত্রা এঙ্গেলসের মনে গভীর দাগ কাটে। তাঁর মতে শ্রমিক শ্রেণির মানুষ গতর খাটিয়েই খেতে চায়। কিন্তু কে তাদের কাজ দেবে? তারা সুখ চায় কিন্তু কোথায় পাবে? সততা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা এসব গুণ থাকলেও খেটে খাওয়া মানুষদের কাজের ও সুখের কোনো নিশ্চয়তা নাই। তাঁর ভাষায় ''আজকে সুন্দর বাতাস বইছে, শ্রমিকরা যা উপভোগ করছে, কিন্তু কাল তা বইবে কিনা তা নির্ভর করছে বুর্জোয়াদের উপর।'' শ্রমিকরা কারখানায় কাজ পাবার জন্য ছটফট করে। বেতন যত কমই হোক তারা কাজ চায়। কারণ তারা মনে করে রাস্তায় থাকার চেয়ে আলো-বাতাসহীন ঘরে থাকা অনেক ভালো। নগ্ন থাকার চেয়ে শতছিন্ন বস্ত্র লজ্জা নিবারণের জন্য যথেষ্ট। ক্ষুধার জ্বালার থেকে আধপেটা থাকা, শাক সিদ্ধ খাওয়া বেশ তৃপ্তিদায়ক। তাই তারা অর্ধেক মজুরিতেও কাজ করতে রাজি হয়। প্রয়োজনে সিকি মজুরিতেও। পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে আমরা এখন চোখের সামনে এ সত্য চাক্ষুষ করছি। পার্শ্বশিক্ষক, গেস্ট টিচার, এম.এস.কে ও

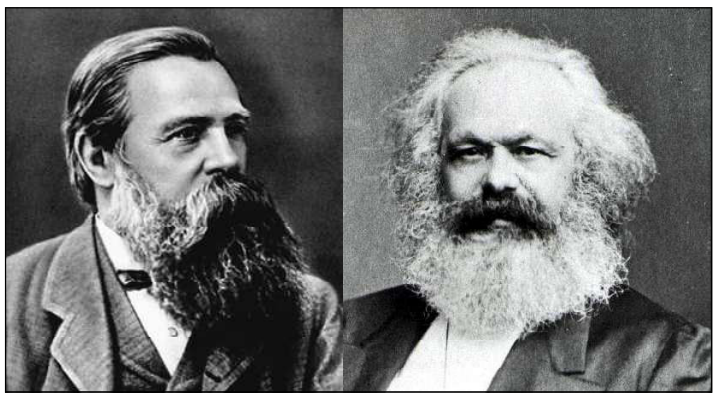

এস.এস.সে শিক্ষক কম্পিউটার শিক্ষক, ডেলিভারি বয়, কন্ট্রাক্টচুয়াল অফিস কর্মী, শ্রমিকদের দেখলেই প্রায় দুই শত বছরের আগের এঙ্গেলসের চিন্তা আজও বাস্তব পরিগণিত হয়।

কেবল সমাজবিজ্ঞান ও ভাষা নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতের এঙ্গেলসের জানার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। শ্রীমতী ফ্রাবের্গার এঙ্গেলসের বাড়িতে থাকতেন। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর এঙ্গেলস মেডিক্যাল সায়েন্স-এর ওই বইগুলি পড়ে সন্তান প্রসব সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন যা সে যুগে প্রসূতি মায়েদের জন্য ভীষণ জরুরি ছিল।

কৃষি সংক্রান্ত যেসব বই কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' লিখতে কাজে লেগেছিল, এঙ্গেলস সেগুলি পড়ে মার্কস-কে সাহায্য করেন। তাঁর দুটি সুআলোচিত পড়ার ঘর বইয়ের তাক দিয়ে ঠাসা ছিল। বইগুলি পরিপাটি করে গোছানো, মেঝেতে কোথাও একটি কাগজের টুকরোও দেখা যেত না। কেবলমাত্র তাঁর পড়ার টেবিলে বই-এর পাহাড়ে এলোমেলো ভাব লক্ষ করা যেতো।

প্রকৃতির শক্তিগুলির উপর ঈশ্বরের প্রভাব বা এগুলিকে স্বয়ং ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করেন এ ধারণা পৃথিবীর কম-বেশি সব দেশেই দীর্ঘদিনের বিশ্বাস। ঝড়, বন্যা, খরা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, ভূমিধস, দাবাগ্নি এসবই দেব ইচ্ছায় ঘটে এমন ধারণা আজও অনেকেই বহন করে। এঙ্গেলস মনে করতেন প্রাকৃতিক শক্তি বা ঘটনাগুলি সম্পর্কে সত্য জ্ঞানই পারবে মানুষের এই ভুল ধারণার নিরসন করতে এবং তার ফলেই দেবশক্তি সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস বা ধারণাগুলি ফিকে হতে থাকবে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর কৃতী ছাত্রদের আচরণের জন্য যে আক্ষেপ অমৃত্যু যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন তারও কারণ প্রাকৃতিক ঘটনায় দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ এই বিশ্বাস। প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত ধারণাই সাপে কাটা রুগিকে মানুষ ওঝার কাছে না নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান। যেদিন থেকে মানুষের কাছে ডাক্তার ও ওষুধ সহজলভ্য হবে তখন থেকেই মানুষের দেবতাদের উপর ভরসা কমবে। তাই এখন মানুষ জলাতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেতে হাসপাতালে যায়। জন্ডিস রুগী নেবার মালা গলায় পরেই ডাক্তার দেখায়। এ নিয়ে এঙ্গেলসের আলোচনাগুলি ভীষণ মনোমুগ্ধকর। তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের ইতিহাস ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের জন্যই যুগে যুগে অসংখ্য বৈজ্ঞানিককে অকালে শ্মশানে অথবা কবরে কিম্বা ফাঁসির মঞ্চে নতুবা কারাগারে যেতে হয়েছে। সের্ভেৎ রক্ত চলাচলের ধারা যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তখনই তাকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করা হয়। জিওদার্নো ব্রুনো, কোপারনিকাস প্রমুখদের, কাকে রেহাই দিয়েছে সমাজকর্তা বা ধার্মিকরা?

এঙ্গেলস বলেছেন ধর্মকে নিষিদ্ধ করা যায় না। জোর করে ধর্মীয় আচরণ বন্ধ করাও যাবে না। ১৮৭৩ সালে ব্লাঙ্কিপন্থীরা ডিগ্রি জারি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাকচ করার চেষ্টা করলে, এঙ্গেলস এদের সমালোচনা করেন প্রলবলভাবে।

এঙ্গেলসের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর শেষকৃত্যে মাত্র কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কয়েকজন নেতা সহ ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজে ওয়াটারলুর রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ১০ আগস্ট ১৮৯৫ সালে তাঁর স্মরণে সভা হয়। ওখানে জার্মান শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বিলখেট বলেন—''এঙ্গেলস এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি মুক্তির পথ দেখিয়েছেন অগ্রণী সেনাপতি হিসাবে। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ তাঁর মধ্যে পূর্ণ সমন্বিত হয়ে উঠেছিল।''

এঙ্গেলস তাঁর মৃত্যুর অনেক আগেই কার্ল মার্কসকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান। মার্কসের মৃত্যুর পর মার্কসের তিন কন্যাকে, মার্কসের বড় মেয়ের মৃত্যুর পর বড় মেয়ের নাবালক শিশুদের ও মার্কসের অপর দুই কন্যাকে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান। কুড়ি হাজার মার্ক দিয়ে যান জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে। তাঁর বিরাট গ্রন্থাগার ও সব নোট দিয়ে যান ঐ পার্টিকে। মার্কসের সঙ্গে তাঁর চিঠিগুলি দিয়ে যান মার্কস কন্যা এলিয়েন-কে। সারা জীবনে কার্ল মার্কস আর্থিক দিক দিয়ে নিজের পরিবারকে কোনো স্বস্তি দিতে পারেননি। তাই এঙ্গেলস কাছে টেনে নিয়েছিলেন ওই পরিবারকে। মহান হৃদয়, মহান ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এঙ্গেলসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিটরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসর পূর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ নভেম্বর : বিপুল উৎসাহের সঙ্গে মেমারি থানার বিটরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসরের পূর্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হল। উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপ্তেন্দু পীরি। ৭৫ বছর আগে বিটরা শিক্ষানুরাগী যোগেশ সেন এই স্কুল স্থানীয়দের সহযোগিতায় স্থাপন করেছেন। আজ মহিরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমান ও পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীরা বিশাল মিছিল সংগঠিত করেন।

অন্য সংস্কৃতি

নীলকণ্ঠ সমাচার : ভাবা প্র্যাকটিস করার বর্ণপরিচয়

দেবেশ ঠাকুর

বিখ্যাত ত্রয়ীকে সমকালীন বাংলা তিন-এক হিসেবে দেখে এসেছেন। সেই সময়কালে আর্ট ফিল্ম আর কমারসিয়েল ফিল্ম বলত। এই দেগে দেওয়া ব্যাপারটা সিনেমা জগতের ক্ষতি করেছে। পোলারাইজেশন। ত্রয়ীগণের ছবি উৎসবে দেখান হবে। আর বাকি সব বাণিজ্যিক ছবিগুলি দেখান হবে সিনেমা হল-এ। আমজনতা অভিযানের নড়বড়ে গাড়ি অথবা অযান্ত্রিকের ঝরঝরে গাড়ি নিয়ে ভাবতে নারাজ। এইসব ছবি তাঁদের বিশ্বাসে দাগ কাটতে পারে না। অনেক বেশি বিশ্বাসভাজন মনে হয় 'সপ্তপদীর' ''এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হত তুমি বলতো''। দর্শকের কাছে সুচিত্রা উত্তম সবাই সত্যি। দ্রুতগতির মোটরবাইকে ক্লোজ শটে সুচিত্রার চুল উড়ছে না এটাও তন্নিষ্ঠভাবে সত্যি। ঋত্বিকের কাছে চ্যালেঞ্জটা সবচেয়ে বেশি ছিল। তাঁর সবচেয়ে বেশি গৌরবময় ছবি দেশভাগ ট্রায়োে। অজস্র ছিন্নমূল মানুষ 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা' দেখেননি। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। ছবি মানে শুধু গল্প নয় ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে শিখছে। বদলেয়ার থেকে জীবনানন্দ—পচা শশা চাল কুমড়ো নষ্ট খেত ইত্যাদি বিশ্বাসী জিনিসগুলো আর সাধারণ মানুষ ঘাঁটতে চাইছে না। লাইফ বড় কথা নয়। তারা চায় লার্জার দ্যান লাইফ।

ঋত্বিক ছিন্নমূল মানুষ। আজ দু হাজার পঁচিশের বাংলাদেশ দেখে অনেকেই বুঝতে পারছেন পায়ের নিচে মাটি সরে গেলে কেমন অবস্থা হয় মানুষের। ছিন্নমূল কথাটি নিছক একটি শব্দবন্ধ নয়। এর পিছনে অনেক আঘাত অনেক অপমান অনেক যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে। মৃণাল সেনও দেশভাগ দেখেছেন। নানা ছবিতে কাহিনির মাঝে বা কোলাজের মাঝে বা রূপকের মাঝে নানা অবস্থার বিন্যাস করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সৎ। সত্যজিৎ শিক্ষিত সংস্কৃতি সম্পন্ন বনেদি পরিবারের সন্তান। দারিদ্র্য এসেছে তাঁর ছবিতে। অশনি সংকেত-এ গৃহহীন অন্নহীন মানুষের আর্তনাদ এসেছে। রায় এবং সেন কলকাতা ট্রিলজি করতে গিয়ে নাগরিক যন্ত্রণা-যাপন বিলাস-বৈষম্য বারবার তুলে ধরেছেন নানা আঙ্গিকে। সেই অর্থে দেশভাগ কাঙ্ক্ষিত আয়তনে আসেনি। কাঙ্ক্ষিত বলা উচিত কিনা জানিনা। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট পরিক্ষেত্র নির্মাণ করে কাজ করেছেন।

ঋত্বিকের ছবি নির্মাণের আগে পরিচিতি ঘটেছে নাটকের সঙ্গে। এই পরিচিতি তাঁর কাছে সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছে। চারের দশকে ভারতব্যাপী আই পি টি এ আন্দোলন যেমন বাম রাজনীতির দিকে তাকে আকৃষ্ট করেছে তেমনই খুব কাছে থেকে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যমুক্তির সংগ্রাম তাঁকে নানা সময় নানা ভাবে উৎসাহিত করেছে। উৎসারিত করেছে। বাম আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের কেমন ভূমিকা হওয়া উচিত সে বিষয়ে গণনাট্য আন্দোলনের সামনে থেকে দিশা দিয়েছেন পি সি যোশী। তিনি নিজে গণনাট্যের মহলা কেন্দ্রে প্রতিদিন বসে থাকতেন। চুপচাপ দেখতেন। কিন্তু কোনদিন কোনো মত চাপিয়ে দেননি। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতারা যেমন করতেন, মূলত ক্ষমতা লাভের পর। নেতারা বোঝেন না এমন কোন বিষয় নেই। যত বড় নেতা তত বিজ্ঞান- সংস্কৃতি- শিক্ষা- কৃষিকর্ম-সাহিত্য সবই বোঝেন। বোঝেন সেটা বুঝিয়েও দেন। পি সি যোশী না থাকলে এদেশের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠত না। ঋত্বিক তাঁকে খুব কাছের থেকে দেখে জানতেন, শিল্পীকে জোর করে জননেতা করে তুলতে গেলে এক সঙ্গে দুই স্বত্তার মরণ ঘটবে। 'শতফুল বিকশিত হোক' শুধুমাত্র আপ্তবাক্য থেকে যাবে। চোখের সামনে দেখতেন শম্ভু মিত্র বিজন ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তৃপ্তি ভাদুড়ী প্রমুখ অসামান্য সৃজন-বিজ্ঞানীদের অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য। ঋত্বিক নিজেও নবান্নতে অভিনয় করেন। মাস্ থিয়েটার আর ক্লাস থিয়েটারের অনুপম সমন্বয় দেখেছেন। একসময় বিখ্যাত শিশির ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে নবান্নের অভিনয় হয়। দিকপাল শিশির ভাদুড়ী বুঝতে পারেননি তাঁর ধ্রুপদী থিয়েটারে অভিনয় ও পরিচালনার পাশাপাশি হাড়-হাভাতে মানুষের চট-টাঙানো খিদের পাঁচালি জনমানসে এত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পরে আর শ্রীরঙ্গম ভাড়া দেননি গণনাট্যকে। এই শিক্ষা ঋত্বিকের কাছে স্মরণীয় উদাহরণ হয়ে ছিল।

এই উদাহরণ, খানিকটা চড়া স্বরপ্রয়োগ নাটকীয় সংলাপ তাঁকে ভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে। ধরা যাক জ্বালা নাটকের সংলাপ। নাটকে একটি পাগল ছাড়া সব পেশার মানুষেরা আত্মঘাতী। কারণগুলো আপাতভাবে ক্লিশে। সকল আত্মঘাতী মানুষগুলিরই মনে হয়; তাঁদের জীবনে ''অর্থ নয় কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে।'' জ্বালা নাটকটি ভীষণভাবে সিনেমাটিক। অন্যভাবে বলতে গেলে কোমলগান্ধার ছবিতে থিয়েটার যেমন আছে বিপুল ভাবে তেমনই আছে থিয়েট্রিকেল এলিমেন্ট। তার কারণ হিসেবে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন, মূলত যাঁদের নিয়ে অভিনয়ের কাজ করিয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগ মঞ্চ থেকে সংকলিত। এ প্রশ্নও এসেছে আধুনিক বাংলা থিয়েটারের রাজাধিরাজ (এ আমার মত) শম্ভু মিত্র অনেকগুলো সিনেমায় অভিনয় করলেও কখনও খুব ভালো মানের চিত্রাভিনেতা মনে করা যাবে না। একথা তৃপ্তি মিত্রের ক্ষেত্রেও খাটে। ব্যতিক্রম বিজন ভট্টাচার্য। থিয়েটারের অভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সত্যজিৎ রায় একবারের জন্যেও বুঝতে দেননি করুণার আগমন আই পি টি এর আঁতুড় ঘর থেকে, শ্রেণি সংগ্রাম থেকে।

এই প্রসঙ্গে বিস্তৃতিতে যাওয়ার আগে ঋত্বিকের আরেকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক। সেটি তাঁর ছবির কাব্যময়তা। ঘটক পরিবার আপাদমস্তক কবি পরিবার। মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) তৎকালীন, এবং এখনও সাহিত্য পরিসরে অগ্রগণ্য নাম। পারিবারিক পত্রিকায় ঋত্বিক সহ অনেকেই লিখতেন। অগ্রজ সহ আরো অনেকের কাব্য প্রতিভা ঋত্বিকের মধ্যেও লতায় পাতায় সঞ্চারিত হয়েছিল। সমকালীন অনেকে যুক্তি তক্কো আর গপ্পোকে বড় মাপের একটি কবিতা মনে করেছিলেন। কেউ কেউ আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সী-র কাব্যময় দর্শন দেখতে পেয়েছিলেন। চ্যাপলিন নিজেকে একজন কবি মনে করতেন। পোয়েট্রি অন সেলুলয়েড। ঋত্বিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী, মনীশ-কন্যা মহশ্বেতা অত্যন্ত বড় মাপের কথাসাহিত্যিক হয়েও কবিতার আশ্রয়ে বাসা বেঁধেছেন বারবার। আরও এগিয়ে বলতে গেলে মহাশ্বেতা-বিজন পুত্র নবারুণের মধ্যে কবিতা চিত্রকল্প ও গদ্যের এত মাখামাখি অবস্থান সম্ভবত সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদার ছাড়া কারো সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

কয়েকটি ছবি থেকে ছোট ছোট কয়েকটি কবিতা-চিত্র-নাটকের সহাবস্থান পাওয়া যেতে পারে। যেটা খোঁজার চেষ্টা করছি, ঋত্বিকের ছবিতে নাটক এবং কবিতার অবস্থান। ধরা যাক, সমরেশ বসু-কে দেখিয়ে উৎপল দত্তকে ঋত্বিক বলছেন, আগে নদী রাস্তা (গঙ্গা, বি টি রোডের ধারে) এসব নিয়ে লিখতেন, এখন পোকা মাকড় গহ্বর (প্রজাপতি বিবর) এসব নিয়ে লেখেন। যে জায়গাটিতে কথাবার্তা চলছে, সেটি সম্ভবত আউট্রাম ঘাটের কাছাকাছি। পাশেই গঙ্গা বহমান। একটু পাশে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন সহজিয়া ফকির গান গাইছেন, 'নামাজ আমার আদায় হইল না'। নদীর পিছনে পড়ন্ত বিকেলের আকাশ। জায়গাটি ভীষণ চেনা। কিন্তু ঋত্বিকের কাব্যময় দৃষ্টির প্রসাদ গুণে একসঙ্গে নাটকীয় শব্দ প্রয়োগের বাঁকমোড় অদ্ভুত একটি বাঙ্ময় নৈঃশব্দ্য নির্মাণ করল। এখানেই ঋত্বিকের শিল্প সৃজনের অননুকরণীয় স্বাতন্ত্র্য। তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ফকিরের মত অপূর্ণতার দীর্ঘশ্বাস।

'মেঘে ঢাকা তারা'-র (১৯৬০) একটি দৃশ্য। সংসারের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত ক্লিষ্ট নীতার জীবনে মধুময় গোপন স্থান। সে দেখা করতে যাবে তার প্রেমিকের সঙ্গে। দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে টগবগ করে উঠে যাচ্ছে। যন্ত্র সঙ্গীতে ঝালা ব্যবহার করেছেন। আনন্দময় পরিমণ্ডল। হঠাৎ নাটকীয় মোড়। প্রেমিকের ঘরে ঘনিষ্ঠভাবে নীতার বোন। উত্তরণটি যত তীব্র ছিল অবতরণটি ততোধিক ধীর। এক পা এক পা করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে নীতা। বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত বিপন্ন। এক একটা সিঁড়িতে পা ফেলা মাত্রই চাবুকের শব্দ। সপাং সপাং। মনস্তত্ত্ব নির্মাণে এর থেকে অনন্য প্রেক্ষাশব্দ আর কিছু হতে পারে না।

সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ-র (১৯৭১) আপাত সমান্তরাল একটি দৃশ্যর উল্লেখ করছি। শ্যামলেন্দু এতদিন যা প্রত্যাশা করেছিল তা পরিপূর্ণ হয়েছে। অফিসে যে পদোন্নতির জন্য তার বাঁকা পথে সুদীর্ঘ লড়াই তা সফল হয়েছে। অতি আনন্দে গৃহিণী এবং শ্যালিকাকে সেই খবরটি দিতে উঁচু ফ্লাটে উপস্থিত। লিফট খারাপ। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তরতর করে উঠে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে তার গতি স্থিমিত হয়ে আসছে। ক্রমাগত এত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শ্যামলেন্দু ক্লান্ত। তার সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

দশ বছর আগে নির্মিত মেঘে ঢাকা তারার সঙ্গে সীমাবদ্ধর এই দৃশ্যটির সমাপতনজাত মিল থাকার কথা বলছি না। কাউকে বিশ্বাস করতেও বলছি না। তাছাড়াও কবিতাই যেমন রূপক এর ব্যবহার হয় নাটক ও ছবিতে ইঙ্গিতের ব্যবহার হয়। ব্যবহার ক্ষেত্রে চিৎকৃত ইঙ্গিত খুব একটা মধুর ঠেকেনা। বরং নানা ধরনের প্যারাডক্স-এর ব্যবহার সাহিত্যের চিত্রায়ন অথবা চিত্রের সাহিত্যায়ন অনেক বেশি পরিণত করে তুলতে পারে। টিএস এলিয়টের

—এরপর চারের পাতায়

ঋত্বিক ঘটক—ধ্বংস ও সৃষ্টি

অরুণাভ চক্রবর্তী

ঋত্বিক ঘটক বাংলার চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। জন্ম ৪ নভেম্বর, ১৯২৫ পূর্ব বাংলায় হলেও জীবনের বেশিরভাগ সময় এপার বাংলায় কাটিয়েছেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের পড়াশোনার ক্ষেত্রগুলি ছিল বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর যৌবনে তিনি দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেখেছেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তিনি দেখেছেন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভারতছাড়ো, নৌবিদ্রোহ পরবর্তীকালে তেলেঙ্গানা ও তেভাগার কৃষক আন্দোলন। সমকালীন উত্তাল ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বামপন্থী বিপ্লবী আদর্শে অবিচল। ১৯৪৭ সালে 'অভিধারা' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এইসময় তিনি নাটক ও গল্প লেখাও শুরু করেন।

নিমাই ঘোষের সহকারি হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রবেশ। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত 'ছিন্নমূল' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর আত্মপ্রকাশ। এরপর ১৯৫২ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'নাগরিক'। 'নাগরিক' চলচ্চিত্রটি স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গভীরতম যন্ত্রণার চিত্রায়ণ। নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব, গতি, যান্ত্রিকতা ও স্বপ্নভঙ্গের আবেশ দর্শককে ঘিরে রাখে। 'অযান্ত্রিক' সমগ্র বিশ্ব চলচ্চিত্রে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। যন্ত্র ও মানুষের সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব, প্রত্যাশা ও প্রেমের কাহিনি। একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রের সাথে সপ্রাণ মানুষের প্রেম ও বিচ্ছেদের কাহিনি। ১৯৫৮ সালে নির্মিত এই চলচ্চিত্র আজও আমাদের বিস্মিত করে।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৮) তাঁর চলচ্চিত্র সাম্রাজ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এক সৃষ্টি। ১৯৬০ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'মেঘে ঢাকা তারা'। মধ্যবিত্ত জীবনের পতনশীল মূল্যবোধ, দ্বান্দ্বিকতা, স্বার্থপরতা—এই সবকিছুই এই চলচ্চিত্রের উপজীব্য। সেখানে পরিবারে জ্যেষ্ঠা কন্যার নিষ্ফল আত্মত্যাগ স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের নেতিবাচক এই দিকটি চলচ্চিত্রে অসম্ভব দক্ষতার সাথে বিম্বিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'কোমল গান্ধার'। উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, আর্তি, ক্লেদ, হতাশা, বিপন্নতা স্পর্শ করে আছে প্রতিটি দৃশ্যকে। একটি বেড়া বিভক্ত করেছে দুটি দেশকে, কিন্তু, বিভক্ত করতে পারেনি হৃদয় ও প্রেমকে। নাট্য আন্দোলনের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ও সম্পর্কের টানাপোড়েন এক গভীর দর্শনের সন্ধান দেয় আমাদের।

তাঁর মহাকাব্যিক সৃষ্টি 'সুবর্ণরেখা'। ১৯৬২ সালে নির্মিত হয়েছিল এই চলচ্চিত্রটি। এই চলচ্চিত্রেও আমরা সন্ধান পাই এক নিম্নবিত্ত পরিবারের। ঘটনাচক্রে সেই পরিবারের মেয়েটি আশ্রয় নেয় পতিতালয়ে এবং তার দাদা খদ্দের হিসাবে প্রবেশ করে। কাহিনিটি কেবল এইটুকুই নয়, এর বিস্তৃতি আকাশের মতো। 'সুবর্ণরেখা'য় ঋত্বিক ঘটক দেখিয়েছেন বহমান নাগরিক জীবনের বৈভব ও ঐশ্বর্যের প্রতি মধ্যবিত্তের আকর্ষণ ও অনুসরণ। মধ্যবিত্তের ভোগ ও অপরিসীম তৃষ্ণার পরিণতি। 'সুবর্ণরেখা' যে 'আশাবাদের'

মধ্য দিয়ে শেষ হয়, সেই 'আশাবাদ' চিরন্তন, কাঙ্ক্ষিত কিন্তু অধরা। অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাহিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন নদীকেন্দ্রিক মানুষের উত্থান ও পতনের স্বপ্নমালা দিয়ে। নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার নানা দিক বিম্বিত হয়েছে এই ছবিতে। এ হলো চিরন্তন-দুখিনী বাংলার কাহিনি। এ কাহিনি নদীর মৃত্যুর, এ কাহিনি নদী নির্ভরশীল মানুষের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া, ১৯৭৭ সালে মুক্তি পায় 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে মতাদর্শের সংঘাত, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একদল তরুণের ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ প্রয়াস, দুঃখী বঙ্গবালার চিরন্তন হতাশা কিংবা বাস্তবতার নিরিখে জীবনকে দেখা—এই সবকিছু নিয়েই তাঁর এই চলচ্চিত্র। এই ক্ষয়ে যাওয়া, গলে যাওয়া, পচে যাওয়া সমাজের হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের কাহিনি।

তিনি অসংখ্য কাহিনি ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, মুশাফির, মধুমতী, স্বরলিপি, রাজকন্যা সহ আরও কয়েকটি। অনেকগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণ করেছিলেন—ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, আমার লেনিন, পুরুলিয়ার ছৌ, দুর্বার গতি পদ্মা ইত্যাদি। তাঁর কয়েকটি অসমাপ্ত ছবি ও তথ্যচিত্র আছে—বেদেনি, কত অজানারে, রামকিঙ্কর ইত্যাদি। ১৯৭০ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৫৭ সালে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার, শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার, সেরা পরিচালক ইত্যাদি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর আন্তর্জাতিক মানের প্রতিটি চলচ্চিত্রে রয়েছে নাটকীয় উপাদান, দ্বন্দ্ব, আধুনিক জীবনের সংঘাত, মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রেম, তরুণের সমাজ বদলের স্বপ্ন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি একটি স্তম্ভ, একটি ইতিহাস, একটি দৃষ্টান্ত, পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের জন্য তিনি রেখে গেছেন এক সুদীর্ঘ পথ, যে পথ ধরে তাদের বহু দূর হাঁটতে হবে।

ভাগচাষি আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ নভেম্বর : পরিবারের সবাই কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরে বসে বিষপান করে আত্মঘাতী হলেন একজন ভাগচাষি রঞ্জিত সিং (৫৩)। ঘটনাটি ঘটে কালনা-২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসানহাটি গ্রামে। রঞ্জিত সিংয়ের নিজস্ব সামান্য জমি থাকলেও অপরের জমি তিনি ভাগে চাষ করতেন। কিন্তু দিন দিন উৎপাদন খরচ বাড়লেও ফসলের সেভাবে দাম পাচ্ছিলেন না। ফলে বাজারে ঋণ হয়ে যাচ্ছিল। তা সামাল দিতে পরিবারের সবাইকে জনমজুরের কাজে মাঠে যেতে হচ্ছিল। এই নিয়ে তিনি কয়েকদিন ধরে হতাশায় ডুবে ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। আজ কালনা হাসপাতালেই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

কৃষক ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে সমবায়কে বাঁচাতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ নভেম্বর : সমবায় সপ্তহে কৃষকদের স্বার্থে সমবায়কে বাঁচানোর শপথ নিলেন সমবায়ীরা। রাজ্যের সমবায় বিশেষ করে কৃষি সমবায়গুলি উঠে গেলে তখন আর কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করার কোন প্রতিষ্ঠান থাকবে না। চরম বিপদে পড়বেন কৃষকরা। তাই কৃষি সমবায়গুলি বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। বক্তব্য রাখেন কাজী নুরুল ইসলাম, সমীর মুখার্জী। সভা পরিচালনা করেন তপন মুখার্জী। ৭২ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালনের অনুষ্ঠানে। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় কালনা মহিলা ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর নিজস্ব কার্যালয়ে সমবায় সপ্তাহ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনা মুখার্জী, মৃদলা রায়, কাজী নুরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সন্ধ্যা হালদার।

কৃষক ও খেতমজুর আন্দোলনের নেতা প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ নভেম্বর : কৃষক ও খেতমজুর আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা মনোরঞ্জন প্রামাণিকের (৬৯) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে তার বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান এলাকার কৃষক ও খেতমজুর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধা জানান কৃষক নেতা শাহাদুল খান, হামিদ শেখ প্রমুখরা। নবদ্বীপ শ্মশান ঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধার সময়ও উপস্থিত ছিলেন কৃষক ও খেতমেজর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। মৃত্যুকালে তাঁর তিন বিবাহিত কন্যা ও স্ত্রী বর্তমান।

বাহান্নবর্তী (১৮)

রত্না রশীদ

নির্বাচনের নামে দেশজুড়ে ধরপাকড় চলছে। খবরে দেখেছি রোজ এতো হাজার—ততো হাজার লোক নাকি অনুপ্রবেশকারী এবং এরা নাকি সব্বাই আগের বিধানসভার ভোটে ভোট দিয়েছে। বছরের পর বছর এলাকায় বসবাস করছে। নাগরিক হবার প্রমাণপত্র রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব রয়েছে এদের কাছে। হঠাৎ করে সরকার/নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে তাদের নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী এইসব এতদিনের নাগরিকেরা আর নাকি নাগরিক নয়। তুঘলকি নিয়মকানুন জনজীবনে অশেষ যন্ত্রণা বয়ে এনেছে। অস্তিত্ব 'নেই' হয়ে যাবার আতঙ্কে এদিক ওদিক পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষ পরিবার পরিজন ও যথাসম্ভব গেরস্থালীর ঢেয়োঢাকনা নিয়ে। রাস্তার কুকুর-বেড়ালও যেখানে থাকে সেই জায়গাটা ইউরিন দিয়ে নিজস্ব এরিয়ার চিহ্নিতকরণ করে রাখে তাদের হুট করে কেউ তাড়াতে পারে না। এই মানুষগুলিও তাঁদের বুদ্ধিমতো এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতগণের পরামর্শ মতো রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করিয়ে নিয়ে এতকাল নিশ্চিন্তে এই রাজ্যে বসবাস করছিলেন। এখন জানানো হচ্ছে, তোমরা এদেশের কেউ নও। তোমাদের নাগরিকত্বের যে প্রমাণপত্র দেখাচ্ছো সেগুলো জাল, অবৈধ। এতদিন কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকার কি করছিল যে এদেশে এতো মানুষ ঢুকে বসবাস করতে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারলো? সরকারি বর্ডার রক্ষাকারিরা কি কেবলই হাওয়া খেতে দেশের সীমানায় মোতায়েন রয়েছে? এর চট্‌জলদি উত্তর হলো, সীমান্তরক্ষীরা ঘুষখোর। তবে তাদের শাস্তি না দিয়ে এদের ঘাড়ে চোট্ কেন? আর এতদিন যে সরকার রাজত্ব করে চলেছে এই এ্যতো এ্যতো অনুপ্রবেশকারীর (!) ভোটে, সেই সরকারটা কোন্ অধিকারে এখনো গদি আঁকড়ে বসে আছে? নির্বাচক অবৈধ হলে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা থাকে কি?

মাৎস্যন্যায় চলছে এই দেশের প্রতিটি সেক্টরের প্রতিটি কর্নারে। সরকারের/নির্বাচন কমিশনের নিজেদের ভুল-ত্রুটিরও খেসারত দিচ্ছে সাধারণ দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষজনের পরিবার। ভুলত্রুমেও যার নাম বাদ পড়েছে, খেসারত দেবে সেই মানুষ যার নাম তোলা বা কেটে উড়িয়ে দেওয়াতে আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। (চলবে)

ভাবা প্র্যাকটিস করার বর্ণপরিচয়

—তিনের পাতার পর

কবিতায় (ওয়েস্ট ল্যান্ড) একটি ছোট্ট শব্দবন্ধ আছে 'কিউ আনডিড্ মি'। একটি নাট্য সংলাপ। একটি রেখাহীন চিত্রায়ন। অথবা ফোটোগ্রাফিক দৃশ্যায়ন। এখানে মৌনতা খুঁজলে মৌনতা। যৌনতা খুঁজলে যৌনতা। এই শব্দবন্ধ একটি বিশাল উপন্যাসের সূচক হতে পারে। এখানে স্রষ্টা দর্শক শ্রোতা পাঠকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিচ্ছেন।

কোমল গান্ধার-এর নাট্যদল নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে এমন একটি অবস্থানে উপস্থিত যার দুই পারে দুই বাংলা, মধ্যিখানে নদী। নাট্যদলও বহতা নদীর মতো। সম্পর্ক এবং পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়। কখনও সখনও নতুন সম্পর্কের চর জেগে ওঠে। একসময় চর থাকে না চরাচর হয়ে যায়। নদীর জল ছুঁয়ে বিজন যেন বলেন, ওই পারে আমার দেশ ছিল। মনে হতে পারে, নৈ:শব্দ্য সবচেয়ে বড় সংলাপ হতে পারত। কবিকে বলতে হয়, কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে। আমরা অনেক সময় মনে করি, ওটা কানে কানে হবে না। কানাকানি হয়ে যাবে।

একটা কথা সকল প্রয়োগশিল্পী বোঝেন। ফিল্ম ইজ ডাইরেক্টরস মিডিয়া। থিয়েটার ইজ এক্টরস মিডিয়া। কোন একটি শট্ পছন্দসই না হলে পরিচালক পঞ্চাশবার টেক্ করতে পারেন। মঞ্চে অভিনেতার একটা শব্দ প্রয়োগ করার পর নির্দেশকের ক্ষমতা থাকেনা সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেই আলোয় সেই দৃশ্যে সেই সংলাপ আবার ফিরিয়ে আনার। থিয়েটারের অভিনেতার সংলাপের শ্বাস, ঘামের গন্ধ, মাটিতে গড়িয়ে পড়া চোখের জল দর্শক সাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে। সেলুলয়েডে তাই দৃশ্য ও অনুভূতিগ্রাহ্য।

ঋত্বিকের আয়ুষ্কাল একান্ন বছর। প্রখ্যাত ত্রয়ীর মধ্যে সব থেকে কম। তার মধ্যে বেশ কিছু বছর সাহিত্য করেছেন। অভিনয় করেছেন। পুনের ন্যাশনাল ফিল্ম ইন্সটিটিউটে সর্বোচ্চ পদে অধিকারী ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই পদে সবচাইতে কৃতী মানুষ ঋত্বিক ঘটক। আবার এই পদে থাকতে গিয়ে শিল্প নির্মাণে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ঘটক। সাংগঠনিক আয়োজন করা স্রষ্টার কাজ হতে পারে না। আবার এই কাজে মহান মানুষেরা না এলে আর কে আসবে! তাই সরকারের ইয়েসম্যান্ গজেন্দ্র চৌহান যখন পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের চেয়ারে বসেন তখন ছাত্রেরা চেয়ারে কাগজ কেটে সর্তকতা জানিয়ে লিখে দিয়েছিলেন, 'ঘটক স্যাট ইন দিস চেয়ার'। এটাই হয়। গাড়ির ইঞ্জিনিয়ার আবগারির অধিকর্তা হয়ে টাকা কামান।

সত্যজিতের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) নির্মাণের তিন বছর আগে ঋত্বিকের ছবি নাগরিক নির্মিত হয়। অবশ্য মুক্তি পেতে আরো বাইশ বছর চলে যায়। ৫৮য় অযান্ত্রিক। সুবোধ ঘোষের অসামান্য কাহিনি। যন্ত্র (যান পড়ুন) কোন এক সময় মানুষ হয়। মানুষও একসময় যন্ত্র হয়ে যায়। জীবজগতের মত জড়জগতের প্রতিও নির্মিত হয় মমত্ব। একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে, নীল আকাশের নিচে (মৃণাল সেন) যে কালী ব্যানার্জিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম তেলেনাপোতা আবিষ্কারের মত কালী ব্যানার্জিকে আমরা মহাসমারোহে পেলাম অযান্ত্রিকে। ভাঙাচোরা গাড়ি আর ভাঙাচোরা মানুষ কোথায় যেন কবিতাঘন বাঙ্ময় হয়ে জড় ও জীবনে একীভবন হয়।

ঋত্বিক ঘটকের সারা জীবন অনুসন্ধানে যে শব্দ বারবার আসে তা হল 'ঘর'। ঘরের ভাব সম্প্রসারণ দেশ। ঘরের বিপরীতার্থক শব্দ ক্যাম্প। কাছাকাছি শব্দ আশ্রয়। সুবর্ণরেখায় দেশ খোঁজা ঘর খোঁজার মহাকাব্যিক ভূমি বদলের মহাভারত। অভিরাম দেশভাগের মানে জানে না। গানের মাস্টারের কাছে শুনেছে। সীতার কাছে শুনেছে। মামা ঈশ্বরের কাছে শুনেছে। শুনে বুঝেছে ঘর মানে চারটি দেয়াল না। ঘর মানে মুক্তি। সেই মুক্তির আশ্রয় এক সময় ছাদ নয়। পরিত্যক্ত সামরিক বিমানবন্দর। প্রজাপতির ডানায় সে এক আকাশ মুক্তি খুঁজছে।

এই মুক্তিই তো খুঁজেছিল নীতা। ছিন্নমূল মানুষের ক্যাম্পে থাকতে থাকতে তার কাছেও ঘর ছিল বন্ধন। নির্দিষ্ট সময়ে অনেক প্রশ্ন আর চোখ এড়িয়ে মাথা গোঁজার আশ্রয়ে সংসার নামক জগদ্দল পাথরটিকে সিসিফাসের মতো ক্রমাগত তুলতে হয়। আবার গড়িয়ে নেমে আসে। অবশেষে ক্লান্ত মানুষটি গানে আশ্রয় পেতে চাইছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের যশোপ্রার্থী দাদার (অনিল চট্টোপাধ্যায়) কাছে গানের বদলে সুরসংযুক্ত যন্ত্রণার আর্তনাদ ঝালিয়ে নেয়। তারপর পাহাড়ের কাছে মুক্তি। চির বিশ্রাম। শেষবারের মতো আকাশ ভরা সূর্য তারা-র মুক্ত পৃথিবী বিমূর্ত পৃথিবীকে চরাচরকে দেখে নিতে চায়।

ঋত্বিক আইপিটি-এর থিয়েটার কর্মীদের যেমন ছবিতে ব্যবহার করেছেন তেমনই আইপিটিএর সাংগীতিক কমরেডদের দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে দেবব্রত বিশ্বাসকে। সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার ঋত্বিকের হাতে পড়ে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। ওইরকম উদাত্ত মুক্ত কণ্ঠের গান শোনার জন্য দর্শক শ্রোতা তৃষ্ণার্ত হয়েছিল বহু দশক ধরে। গানের ব্যবহার যেমন কাব্যময় তেমনই প্রয়োজন মাফিক নাট্যময়। ধরা যাক, যুক্তি তক্কো ও গপ্পোর সেই দরিদ্র পরিবারে ভাতের থালা ছুড়ে ফেলা। মেয়েটির (শাঁওলী মিত্র) চোখে তখন যন্ত্রণার জলধারা। তার চিবুক ধরে সান্ত্বনার সংলাপ দেবব্রতর গানে 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে'। এরা চাহে না তোমারে চাহে না বলার সময় অদ্ভুত একটা নাট্য মুহূর্ত নির্মিত। চর্বিত চর্বণের কমনীয়তা এখানে নেই। যে শর ক্রৌঞ্চনিধন করে তাই স্বর হয়ে সুরধনী হয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক স্বতন্ত্র এবং ব্যতিক্রমী। তথাকথিত আধুনিক গানের প্রয়োগ একেবারেই করেননি। লোকায়ত, গণসংগীত এবং রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে সংগীতের চর্যাপদ। এক্ষেত্রে আরও বলতে হয় সংগীতের প্রস্তাবনা-ক্ষেত্র খুব যৌক্তিক। সাংগীতিক সাহিত্যিক নাট্য পরিবারে জন্মে ঋত্বিকের গানের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছিল। সেকালের ছবিতে প্রেমিক-প্রেমিকা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সুযোগ পেলেই গান গেয়ে দিত। ঋত্বিক কিন্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আপসহীন। সত্যজিতও গানের ব্যাপারে দর্শকের চাহিদা ও উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি। গুগাবাবা সিরিজ ছাড়া মাত্র দু-খানি গান রচনা করেছেন। চিড়িয়াখানায় 'ভালোবাসার তুমি কি জানো'। দেবীতে শ্যামা বিষয়ক। বাকি গানের খিদে মিটিয়ে নিয়েছেন শাস্ত্রীয় লোকায়ত দক্ষিণী সহ নানা গানের মধ্য দিয়ে গুপীবাঘায়।

এখানে একটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে। মৃণাল সেন নীল আকাশের নিচে ছবিতে গানের প্রয়োগ নিয়ে প্রযোজক তথা সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, 'আমার ছবিতে গান'! যেন কৃষ্ণ উপাসনায় রসুন! হেমন্তও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিলেন, তাঁর গানই এই ছবিটির প্রাণ হয়ে ছবিটিকে বাণিজ্যসফল করে তুলবে। চাপের মুখে ঢেঁকি গিলতে হয়েছিল। ছবির দুটি গান, 'নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবী' এবং 'ও নদীরে' আজও মানুষের মুখে মুখে ঘোরে।

সুবর্ণরেখার অভিরাম ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে-র কাঞ্চন ঘর ছাড়তে চায়। এখানে উল্লেখযোগ্য শিবরাম চক্রবর্তীকে ঋত্বিক যতটা বুঝেছেন খুব কম মানুষ ততটা বুঝতে পারে। চ্যাপলিন প্রমাণ করে দিয়েছেন প্রতিটি মজার পেছনে কিছু বেদনা থাকে। একজন পৃথুলা হাঁটতে গিয়ে কলার খোসায় পা দিয়ে পড়ে গেলে আঘাত এবং কষ্ট পান। সেই কষ্ট অন্যের আনন্দ। শিবরাম যে কত বড় সিরিয়াস লেখক বারবার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা, মস্কো বনাম পন্ডিচেরি এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

কাঞ্চনের বাড়ি ছেড়ে আসা অনেকটা নাটকীয় মুহূর্তে। তারপর পালিয়ে কলকাতা শহর। এখানে ট্রাফিক পুলিশ বেসুরে গান গায়, কত লতুন লতুন ফুল ফুটিয়াছে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত এ লিখেছিলেন, কাবুলিওয়ালা গান গায় জাহাজে না চড়লে জানা যেত না। কলকাতা কাঞ্চনকে সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ ভিন্নরূপে চেনায়। ক্রমাগত তার গ্রামের চেনা ছবি পুকুরঘাট আমতলা দুষ্ট গ্রাম-বন্ধুরা একে একে স্মৃতিতে ভিড় করে আসে। ছবিতে যেটি সবচেয়ে ভালো লাগে, ঋত্বিক ছিন্নমূল। বাধ্য হয়ে কলকাতায় আস্তানা খুঁজে নিতে হয়েছিল। কাঞ্চনের (পড়ুন শিবরাম) কলকাতা আসা ঐচ্ছিক। এইখানেই অভিরাম আর কাঞ্চনকে পাশাপাশি বসিয়েছেন ঋত্বিক। কাঞ্চন বড় হয়ে সংসার পাবে না। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে তক্তারামে শুয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। পরশুরামের পরে হাস্যরসের অনন্ত ঈশ্বর্য নিয়ে ভাগ্যিস এসেছিলেন কলকাতায়।

নদী নিয়ে অনেক মহান উপন্যাস রচিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের ইছামতী। মানিকের পদ্মা নদীর মাঝি। সমরেশের গঙ্গা। দেবেশের তিস্তা পারের বৃত্তান্ত। অদ্বৈতের তিতাস একটি নদীর নাম। তিতাস অসামান্য একটি কথাসাহিত্য। আমার কাছে বারবার মনে হয়েছে মানুষকে ঘিরে নদী, নদীকে ঘিরে মানুষের কবিতা। মালোপাড়ার মানুষেরা গরিব। কিন্তু নদীর অনন্ত ঐশ্বর্য্যে প্রত্যেকেই জীবন শিল্পী। নদীর জনম নদীর মরণ। সুবল বাসন্তী অনন্ত—এরা যতটা না ভূমিজ তার থেকে বেশি জলজ। বাংলাদেশের প্রযোজনায় তিতাস একটি অসামান্য চলচ্চিত্র। শুরুতেই নাটকের অনেকগুলি বিষয় এসে গেছে। এক্সপোজিশন কমপ্লিকেশন ডিজোলিউশন। নদী কত কি কেড়ে নেয়। নদী কত কিছু ফিরিয়ে দেয়। ফেরাতে ফেরাতেই নিজে নিঃস্ব হয়ে যায়। এত ভালো প্যানরামিক ট্রিটমেন্ট খুব বেশি ছবিতে আনা গেছে বলে মনে হয় না। এখানে বারবার আকিরা কুরোসোয়ার দিগন্তপ্রসারী চিত্রপটের ছায়া দেখতে পাই। এই ছবিতে অনেক গানের ব্যবহার আছে। লোকায়ত লোকাচারের গান। ভাটিয়ালি। ঋত্বিক যেন নিজেকে উজাড় করে মাটির গর্ভ থেকে তুলে এনেছেন সভ্যতার বীজ থেকে লোকজীবনের মহীরুহ।

ঋত্বিকের ছবি আমাদের বারবার ভাবায়। চারিদিক থেকে বহু অ্যাঙ্গেলে ভাবায়। আরো ভাবার উপকরণ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

শেষে নিজেরাই নিজেদের বলি, ভাবুন ভাবুন। ভাবা প্র্যাকটিস করুন।

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-